**মানবতার মুক্তিসনদদাতা বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সা.)**

-মাওলানা মো. নূরুজ্জামান

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্ময়কর অবদান সম্যক উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। রসুলে করিমের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মানবজাতির অবস্থা ছিল ঘোর তমসাচ্ছন্ন। হযরত ইবরাহীম (আ:) এবং তৎপরবতী মুসা-ঈসা প্রমুখ নবীদের প্রচারিত তওহীদের শাশ্বত আদর্শ তখন ধুলায় অবলুণ্ঠিত। সত্য ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্রষ্টায় অবিশ্বাসের মাধ্যমে কেউ তখন বদ্ধ নাস্তিকে পরিণত, কেউবা ধর্মের নামে পাথর বা মাটির গড়া অসংখ্য দেবতার আরাধনায় মত্ত- আবার কেউবা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সমুদ্র-পর্বত, অগ্নি, প্রস্তর প্রভৃতিকেই তাদের আরাধ্য দেবতা রপে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছিল। এক দিকে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মতো অহমিকা, অন্যদিকে সৃষ্টিকেই স্রষ্টা ও প্রভু মনে করার মতো হীন মানসিকতার ফলে মানুষ হারিয়ে বসেছিল এ বিশ্ব-জগতে তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা। এই অস্বাভাবিকতার প্রভাবে সেদিনের সমাজে বিরাজ করছিল সীমাহীন নৈরাজ্য। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, বর্ণে-বর্ণে, গোত্রে-গোত্রে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষে বিরাম ছিল না। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অথনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ, বঞ্চনা, বিচার, অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার হয়ে উঠেছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এরই ফলশ্রুতিতে মানব-সমাজে মুক্তি, শান্তি, প্রগতির আশা হয়ে উঠেছিল সুদূরপরাহত।  
মানব-ইতিহাসের এই ঘোর দুর্দিনেই হযরত মুহাম্মদ (সা:) আবির্ভূত হন মুক্তির মহাপয়গাম নিয়ে।

আজ বুধবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস।দিনটি সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২৯ আগস্ট, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার, সূর্যোদ্বয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে, সুবহে সাদিকের সময় মহাকালের এক মহাক্রান্তিলগ্নে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবার তেষট্টি বছরের এক মহান আদর্শিক জীবন অতিবাহিত করে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন, ১১ হিজরি রবিউল আউওয়াল মাসের ১২ তারিখ একই দিনে তিনি পরলোক গমন করেন। দিনটি মুসলিম সমাজে ‘ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) নামে সমধিক পরিচিত। ঈদ, মিলাদ আর নবী তিনটি শব্দ যোগে দিবসটির নামকরণ হয়েছে। ঈদ অর্থ- আনন্দোৎসব, মিলাদ অর্থ- জন্মদিন আর নবী অর্থ নবী বা ঐশী বার্তাবাহক।

তাহলে ঈদে মিলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্মদিনের আনন্দোৎসব। ১২ রবিউল আউওয়াল একই সাথে মহানবীর জন্ম ও মৃত্যু দিবস হলেও তা শুধু জন্মোৎসব হিসেবেই পালিত হয়। পৃথিবীর যেকোনো মানুষের মুত্যুই তাঁর পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে। কিন্তু মহানবীর মৃত্যু মানবসমাজ ও সভ্যতার কোনো পর্যায়ে কোনো শূন্যতার সৃষ্টি করেনি। যদিও তাঁর মুত্যুর চেয়ে অধিক বেদনাদায়ক কোনো বিষয় উম্মতের জন্য হতে পারে না। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য আল্লাহর রহমত হিসেবে। এরশাদ হয়েছে, আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি । (সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭) এরশাদ হয়েছে, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতরাজিকে পূর্ণতা দিলাম আর ইসলামকে তোমাদের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা আল-মায়িদা ; ৩)

রবিউল আউওয়াল মাস এলে মুসলিম সমাজে মিলাদ মাহফিল ও সিরাত মাহফিল আয়োজনের ধুম পড়ে যায়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) যে আদর্শের সুষমা দিয়ে একটি বর্বর জাতিকে আদর্শ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুটতে থাকা একটি সমাজকে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে এনে দিয়েছিলেন; সেই মহান আদর্শে উত্তরণের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। মহানবীর আদর্শ অনুসরন না করে শুধু মিলাদ মাহফিল আর সিরাত মাহফিল আয়োজনে কোনো লাভ নেই। কারণ মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শকে জীবনে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, ‘হে রাসুল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (সুরা আল-মায়িদা : ৩১) রাসুলুল্লাহ (সা.) চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেই একটি শ্রেষ্ঠ জাতি গঠন করেছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন নিশ্চয়ই আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ইবনে মাজা) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ ধারণ করেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যুগের সর্বোত্তম মানুষ হতে পেরেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ। (সহীহ বোখারি)

রসুলে করিম মানব জাতির সামনে যে মহাসনদ তুলে ধরলেন তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য- মানুষকে তার স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। মানুষ যে খোদা নয়, তেমনি সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামও নয়- অসংখ্য মিথ্যা খোদার গোলামিকে অস্বীকার করে মানুষ এভাবেই নতুনভাবে তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করল। রসুলে করিমের এ মুক্তিসনদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর প্রচারিত জীবনবিধানের সার্বজনীনতা ও পূর্ণাঙ্গতা। অতীতে বিভিন্ন নবী-রসুলের মারফৎ সমস্ত অবতীর্ণ জীবনবিধান ছিল বিশেষ কাল এবং বিশেষ গোত্র, সম্প্রদায় বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট মানব জাতির ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করার পরই মাত্র একটা সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল; আর এ দিনটি যখন এলো আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুলের মারফৎ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন-

‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।’

হযরত মুহম্মদ মানবমুক্তির যে মহাসনদ দান করেন, তার ভিত্তি ছিল কলেমায়ে তায়্যেবা- ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর সর্বশেষ বাণীবাহকরূপে মুহাম্মদ মুস্তফার রিসালতে বিশ্বাস এর দ্বিতীয় স্তর। আর এর প্রথম স্তর এক আল্লাহয় বিশ্বাস। এক আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস নিমেষে মানুষকে মুক্তি দিলো নাস্তিকতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং বহুদেবত্ববাদের হীনম্মন্যতা থেকে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সমুদ্র-পর্বত, বাদশাহ-পুরোহিত, মূর্তি-প্রস্তর এই অসংখ্য দেবতার দেবত্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ এ ধরাধামে সৃষ্টির সেরা ‘আশরাফুল মখলুকাত’ এই অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো।  
মানুষের এই আধ্যাত্মিক মুক্তির ফলে তার আধিমানসিক মুক্তির পথও গেল সুগম হয়ে। বহুদেবত্ববাদের প্রভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে যে মানুষ গতকালও দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে, আল-কুরআনে তাদের সম্পর্কেই ঘোষণা করা হলো, ‘ওয়া সাখখারা লাকুম মা ফিল-আরদি জামীআ’। বিশ্ব-প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুকে তোমাদের অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতি মানুষের পূজার বস্তু নয়- মানুষের সেবার জন্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে- ইসলামের এ শিক্ষা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃতিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কর্মে। শুরু হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সাধনা ও অভিযান; যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সম্ভব হয়ে উঠল আধুনিক বিজ্ঞানের নয়া জয়যাত্রা।  
মহানবী মুহম্মদের মুক্তিসনদ আরও ঘোষণা করল- এ বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক এক আল্লাহ, সুতরাং সমগ্র মানবজাতিও এক ও অবিভাজ্য। রসুল ঘোষণা করলেন, মানবজাতি এক আল্লাহর পালন ব্যবস্থা বা রবুবিয়তের অধীন একটি পরিবার বিশেষ। সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণে-বর্ণে, গোত্রে-গোত্রে, স¤প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে যে বৈষম্য এত দিন মানবজাতিকে শতধাবিভক্ত করে রেখেছিল, নিমেষে তার অবসান ঘটল। রক্ত, বর্ণ ও বংশগত আভিজাত্যের সমস্ত গরিমাকে চূর্ণ করে দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করল-

‘ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, -

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানী যে সবচাইতে নীতিপরায়ণ। রাসুল ঘোষণা করলেন আরব-অনারবে, সাদা-কালোতে কোনো পার্থক্য নেই- সকলেই আদম থেকে এসেছে- আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।  
যে যুগে পৃথিবীর বহু দেশে নারীকে সমস্ত পাপের আধার মনে করা হতো, নারীর মধ্যে আত্মা আছে কি না এই উদ্ভট গবেষণায় ব্যস্ত ছিল সারা ইউরোপ- সেই সময় মুহম্মদ প্রচার করলেন নারীর মুক্তিবার্তা। ঘোষণা করা হলো, নারী-পুরুষ কেউ কারো প্রভু বা দাস নয়। ঘোষণা করা হলো, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ভূষণস্বরূপ। স্বীকার করা হলো নারীর স্বাধীন উত্তরাধিকার।

মায়ের পায়ের নিচে নির্দিষ্ট হলো সন্তানের বেহেশত।  
নারীর মতোই ক্রীতদাসের মুক্তিবিধানও রসুলের অন্যতম কৃতিত্ব। ক্রীতদাসের মুক্তিদান অসীম পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করা হলো। দাসদের প্রতি মানবেতর আচরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। রসুল ঘোষণা করলেন, যে খাদ্য নিজেরা খাবে দাসদেরও তা খেতে দেবে, যে বস্ত্র নিজেরা পরবে, দাসদেরও তা পরতে দিতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ ঘোষণার ফলে তদানীন্তন আরবের সমাজব্যবস্থায় কী মহাবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।  
রসুলে করিমের মুক্তি-আদর্শ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করল এক অভাবনীয় বিপ্লব। আল্লাহ আসমান-জমিনের মাঝে সবকিছুর মালিক, মানুষ তার সমূহ ভোগ করবে আমানতদার হিসেবে- সমাজের অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। এই শিক্ষার আলোকে রসুল ঘোষণা করলেন, তোমাদের যার অতিরিক্ত কোনো সম্পদ আছে, সে ওটা তাকে দিয়ে দেবে যার একেবারেই নেই। মুনফাখোরী মজুদদারী নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, শোষণের হাতিয়ার সুদ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো জিহাদ। সমাজের সম্পদ যাতে গুটিকতক ধনিকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়, যুগ-যুগান্তের ভুখা-নাঙ্গা মানব যাতে সমাজের সম্পদে তার বাঁচার অধিকার লাভ করে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হলো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রসুলের মুক্তিসনদ এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলল, যার ফলে একনায়কত্ব ও রাজতন্ত্রের সেই অন্ধকার যুগে মদিনায় এক নজিরবিহীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো। এ সাধারণতন্ত্রে, আইনের চোখে সব মানুষ ছিল সমান। রাজতন্ত্রের সেই অন্ধ যুগে স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক বা গভর্নরের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও বিচার বিভাগের কাছ থেকে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু, নির্বিশেষে যে কোনো সাধারণ নাগরিক ইনসাফ আদায় করতে পারত। শাসক-শাসিতের ব্যবধান গেল ঘুচে, রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত নাগরিককে সমভাবে প্রতিপালন করাই হলো এ সাধারণতন্ত্রের পরিচালকদের প্রধান চিন্তা। তাঁরা নিজেদেরকে জনসাধারণের প্রভু মনে করেন না, মনে করতেন সেবক আর তাই শাসক হয়েও নিজেদের জন্য সবহারার জীবন বেছে নিয়ে তারা সতত নিয়োজিত থাকতেন জনগণের কল্যাণ-চেষ্টায়। প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের অনেকের ধারণা, ন্যূনতম শাসনের মাধ্যমে সর্বাধিক ইনসাফ কায়েম রাখা যায় যে সমাজে, সেটাই সর্বাধিক মুক্তি ও প্রগতির দাবিদার। রাষ্ট্রীয় শাসনবিহীন এরূপ সমাজের বাস্তব দৃষ্টান্ত জগতে কোথাও নেই। কিন্তু চৌদ্দশত বছর পরে মদীনায় রসুল এমন এক সমাজ কায়েম করেছিলেন, যেখানে ন্যূনতম শাসনের মাধ্যমে নজিরবিহীন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। পুলিশবিহীন এ সমাজে রসুলে করিম এমন এক উন্নত চরিত্রের নাগরিক সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যারা কোনো অপরাধ করে ফেলবার পরপরই পুলিশ-মিলিটারির ভয়ে নয়- নিজেদের বিবেকরূপী পুলিশের তাগিদে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লোকসমক্ষে অপরাধ প্রকাশ করে তার শান্তি পাবার জন্য অধীর হয়ে উঠতেন। কোনো সমাজের শাসনমুক্তির এ নজির সভ্যতার ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ।

মোটের উপর কী আধ্যাত্মিক, কী আধিমানসিক, কী সামাজিক, কী নৈতিক, কী রাজনৈতিক, কী অর্থনৈতিক-মানব জীবনের যে দিকেই তাকাই না কেন, রসুলে করিম মুক্তির এমন এক মহান অনন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন- অদ্যাবধি জগতে তার সমকক্ষ কোনো মুক্তিসনদ কেউ দান করতে পারেনি। এখানেই মানবতার মুক্তির সনদদাতা রূপে বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠত্ব।

মাওলানা মো. নূরুজ্জামান

সিনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

খায়রুল্লাহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

ইমেইল nzaman2012@gmail.com